বাংলাদেশ : রবীন্দ্রপত্রের প্রেক্ষাপটে

গৌরচন্দ্র সাহা

বাংলাদেশ তথা পূর্ববঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের শিকড়ের সন্ধান করতে গেলে আমাদের পৌঁছতে হবে অনেক দূরে—উত্তরপ্রদেশের কনৌজ বা কন্যাকুব্জ অঞ্চলে। কিংবদন্তি অনুসারে মহারাজ আদিশূরের সময়ে বাংলার ব্রাহ্মণকুলে এক অবক্ষয়জনিত মালিন্য বা গ্লানির পরিবেশ সৃষ্ট হয়। এই গ্লানি থেকে মহারাজা আদিশূর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে এবং তার হৃত-গৌরবকে ফিরিয়ে দিতে নতুন রক্ত সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে পাঁচ জন কুলীন ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করে এনে অধুনা বাংলাদেশের যশোহর খুলনা অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আধুনিক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা সেই কনৌজ-কৌলীন্যের উত্তরাধিকারী। পরবর্তীকালে ম্লেচ্ছদোষদুষ্ট হয়ে এঁদের বংশধরদের কেউ কেউ ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হন। পরিণামে তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কসূত্রে জড়িত সকল ব্যক্তিই সমাজব্যবস্থার ধ্বজাধারী কূল-মেল-স্থিরীকরণের প্রবক্তা ঘটকদের হাতে প্রায় অচ্ছুত নিম্নস্তরের হিন্দু বলে পরিগণিত হলেন এবং পীর-আলির অনুবর্তী পীরালি ব্রাহ্মণরূপে প্রায় পতিত অসম্মানিত জীবন ধারণের ও জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবেন। হিন্দু অভিজাত সমাজে এঁরা রইলেন অপাংক্তেয়। এঁদের পুত্র কন্যাদের বিবাহ ইত্যাদিও কঠিন হয়ে পড়ল। এমনই এক পীরালি পুরুষ ছিলেন শুকদেব। এঁর কন্যাকে বিবাহ করেন পিঠাভোগের জমিদার জগন্নাথ কুশারী। জগন্নাথ কুশারী বর্ণ হিন্দু হলেও পীরালি গোত্রে বিবাহহেতু সমাজে 'এক ঘরে' হন এবং এঁরই এক অধঃস্তন বংশধর ভাগ্যান্বেষণ এবং অপেক্ষাকৃত সম্মানজনক জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে ইংরেজশাসিত কলকাতায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। কলকাতা তখন পাড়া-গ্রাম নয়। সমাজপতিদের প্রতাপও ইংরেজ-আইনে কিছুটা ম্লান। সেখানকার সামাজিক আবহাওয়াও দমবন্ধ করার মতো নয়। যেহেতু আদিতে ব্রাহ্মণ এবং উপবীতধারী—ব্রাহ্মণ আশপাশের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা এঁদেরা 'ঠাকুর' সম্বোধন আখ্যায়িত করতেন। ক্রমে এঁদের পুরানো 'কুশারী' পদবীটাই মুছে গেল, যুক্ত হল 'ঠাকুর' উপাধি। দ্বারকানাথ ঠাকুর—প্রিন্স দ্বারকানাথ এই ঠাকুর বংশেরই সন্তান এবং যৌবনে তিনি ধনে মানে কলকাতার অভিজাত সমাজে অগ্রগণ্য ইংরেজ প্রজা। দ্বারকানাথের পালক পিতা রামলোচন ঠাকুরও বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। বাংলাদেশে শিলাইদহ সন্নিহিত বিরাহিমপুরের জমিদারি তিনিই ক্রয় করেন। দ্বারকানাথও সেই ধারা বজায় রেখে সাজাদপুর কালীগ্রাম পতিসরে বিস্তীর্ণ জমিদারির অধিকারী হন এবং দ্বারকানাথ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যৌবনে ধর্ম এষণায় আপ্লুত হলেও জমিদারিগুলি নষ্ট হতে দেন নি। সত্য কথা এই যে ঘোর আর্থিক দুর্দিনে বাংলাদেশের জমিদারিগুলির প্রাপ্ত খাজনা থেকেই এই বৃহৎ পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হত। প্রজাদের প্রতি একটা মমত্ব দেবেন্দ্রনাথের ছিল এবং সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও তা সংক্রমিত হয়েছিল। দৈব দুর্যোগে জমিদারির শস্যহানি ঘটলে এবং প্রজারা খাজনা দিতে না পারলে দেবেন্দ্রনাথ অন্যত্র থেকে অর্থের সংস্থান করেও প্রজাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন বহুবার। রবীন্দ্রনাথও বিলক্ষণ জানতেন

প্রজাদের অন্নে তাঁদের পুষ্টি। তাই পরবর্তীকালে প্রজাদের সুখে রাখবার জন্য চাষবাসের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা শিখে আসবার জন্য পুত্র ও জামাতাকে আমেরিকা পাঠিয়েচিলেন, তাঁদের বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রজাদের অর্থেই তাঁদের বিদেশে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং, কৃতকার্য হয়ে দেশে ফিরে প্রজামঙ্গলে আত্মনিবেশ করা তাদের প্রথম কর্তব্য। তারপরের ইতিহাস তো পাঠকের জানা।

২

রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলাদেশের স্পর্শ পেলেন ১৮৭৫ সালের শেষভাগে। এ বছর ৫ ডিসেম্বর কিশোর রবীন্দ্রনাথ জলপথে পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এলেন শিলাইদহে। সম্ভবত বোটেই চিলেন। বোটে রক্ষিত একখানি গীতগোবিন্দ পেয়ে কবি তাতেই বুঁদ হয়ে রইলেন। সংস্কৃত ভাষার উপমা উৎপ্রেক্ষা অনুপ্রাসের চমকে ঝলকে। এই যাত্রাতেই কবি এলেন রামপুর বোয়ালিয়ায় ব্রাহ্মভক্তদের মধ্যে। একটি ব্রহ্মসংগীতও গেয়েছিলেন বালক কবি। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সংবাদসূত্রে এটুকুই জানা যাচ্ছে। এই ভ্রমণকালেই কবি কলকাতা থেকে চারখানি চিঠি পেয়েছেন। সদর দপ্তরের খরচ-খাতায় ডাক মাসুলের উল্লেখ আছে। অনুমান করতে দ্বিধা নেই এই চিঠিগুলি কাদম্বরী দেবীর লেখা, কিন্তু একখানি চিঠিও রক্ষা পায় নি কালের কবল থেকে।

কবি পরের বার শিলাইদহে এলেন ১৮৭৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি, সঙ্গে অভিভাবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ-যাত্রায় শিলাইদহের নৈসর্গিক সৌন্দর্য বেশ ভালোভাবে উপভোগের সুযোগ পেয়েছিলেন কবি। অবাধ স্বাধীনতা মিলে ছিল দাদার কাছ থেকে। তাই মাঠে ঘোড়া ছোটানো থেকে হাত কাটা বিশ্বনাথ শিকারির সঙ্গে বাঘ শিকারে অংশ নেওয়া বা ফুলের রস দিয়ে তৈরি কালিতে কবিতা লেখার উদ্ভট প্রয়াসেও বাধা আসেনি কবির। শিলাইদহে থেকে কলকাতায় ফিরে এসে কবি বেশ কটি চিঠিও দাদাকে লিখেছিলেন। সেগুলিও পাওয়া যায় নি। পেলে হয়তো জানা যেত কবির মানসলোকে শিলাইদহে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

৩

এর পর সুদীর্ঘ বিরতি। ১৮৮৩ সালের শেষভাগ পর্যন্ত কবির মনে শিলাইদহে নিয়ে তাপ উত্তাপের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তেমন ভাবে আমাদের হাতে নেই। এর মধ্যে বিলেতে গেছেন, ফিরেও এসেছেন। লেখাপড়ায়, অভিনয়ে, কবিতা-রচনায় মন দিয়েছেন, কিন্তু শিলাইদহ নিয়ে 'প্রায়-নিশ্চুপ'।

১৮৮৩ সালের সেপ্টেম্বর পিতা দেবেন্দ্রনাথ মুসৌরি থেকে পুত্র রবীন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠালেন। কারণ খুব স্পষ্ট নয়। তবে মনে হয় সদ্য-যুবক পুত্রকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পিতা তখন ব্যগ্র-সেই নিয়েই আলোচনা। বিবাহ-উত্তর জীবনে কবি কী করতে চান বা কোথায় স্থিত হতে চান এ নিয়েও নিশ্চয় আলোচনা হয়েছিল কারণ কবির বিবাহের দুদিন পূর্বে ৭ ডিসেম্বর বক্সার থেকে লেখা একপত্রে মহর্ষি পুত্রকে লিখছেন : 'এই ক্ষণে তুমি জমিদারির কার্য্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমীদের নিকট হইতে জমা ওয়াশীল বাকী ও জমা খরচ দেখিতে থাক।...না জানিয়া শুনিয়া এবং কার্য্যের গতি বিশেষ

অবগত না হইয়া কেবল মফঃস্বলে বসিয়া থাকিলে কিছুই উপকার হইবে না।'—এই পত্রসূত্রে এমন অনুমান করতে অসঙ্গত হবে না যে কবি কর্মক্ষেত্র হিসেবে প্রথম পছন্দের জায়গা রূপে বাংলা দেশের নামই পিতাকে বলেছিলেন। কিন্তু মহর্ষি রাজি হন নি। কারণও তাঁর পত্রে স্পষ্ট।

কবিও দ্বিতীয়বার পিতাকে অনুরোধ করতে সাহস পাননি, কারণ মহর্ষির আদেশই তাঁদের কাছে হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের আদেশ!

তবে মহর্ষির চিঠিতে আশ্বাসবাণীও কিছু ছিল। তিনি লিখেছিলেন 'প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানীর পত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতি সপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্তমতে আমি তোমাকে উপদেশ দিব এবং তোমার কার্য্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিব।'

১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর কবির বিবাহ সম্পন্ন হল মহাসমারোহে, যদিচ সে বিবাহে—দেবেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না। বিবাহের কয়েকদিনের মধ্যে কবি সপরিবারে যশোর ঘুরে এসেছিলেন বলে প্রিয়নাথ সেনকে লেখা পত্রের সাক্ষ্য থেকে জানাও যায়। যাই হোক, ইচ্ছে থাকুক বা না থাকুক পিতার আদেশ শিরোধার্য করে কবি নিয়মিতভাবে কলকাতায় সদর কাছারিতে কর্মে লিপ্ত হলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মহর্ষির প্রীতি অর্জন করলেন। জমিদারি চালনার দুরূহ আরবি ফার্সি শব্দ এবং তার তাৎপর্য বুঝে নিয়ে নাজাই, জমা, ওয়াসিল, দাগ খতিয়ান শিকোস্তি পয়োস্তি, চাপড়ি প্রভৃতি বিষয়ে কবি দিব্যি সড়গড় হয়ে উঠলেন। ক্রমে মহর্ষি তাকে শিলাইদহের পর্যবেক্ষক এবং আরও পরে পূর্ববাংলার সবকটি জমিদারির সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করলেন। কবিও কখনো পিতার প্রত্যাশার অমর্যাদা করেননি। শিলাইদহের দায়ভার পেয়েই কবি সেখানে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে রীতিমতো সংসার স্থাপনা করলেন। কবি এখন থেকেই মুখ্যত জলপথে পরিক্রমায় বের হতেন সাজাদপুর কালীগ্রাম পতিসরের জমিদারিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে। এই ভ্রমণগুলি কবির কাছে ছিল আনন্দে পরিপূর্ণ। শিলাইদহকে কবি ভালোবেসেছিলেন তার নির্জন বালুবেলার জন্য, তার মোহময়ী সকাল সন্ধ্যাগুলির জন্য, চক্রবাকের কলরব মুখরিত চরভূমির জন্য। সাজাদপুর পতিসর তাঁকে টেনে আনত সহজ সরল প্রজাদের দেখা পাবার জন্য, তাদের আনন্দ দুঃখ ভাবনা বেদনার শরিক হবার জন্য। সব মিলে পদ্মা যমুনা গোরাই, নাগর নদী-বিধৃত অন্তহীন চলনবিলের জলরাশির জন্য কবি যেন আত্মীয়সুলভ উৎকণ্ঠায় উদ্বিগ্ন থাকতেন। বাংলাদেশের নৈসর্গিক প্রকৃতি। তার সজীব প্রকাশ—যেন তারও প্রাণ আছে মন আছে, রোষ আছে, আছে ভালোলাগা, ভালোবাসা—এ সবের সঙ্গে জড়িত হয়ে কবিও যেন কেমন করে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যান তা তিনি ভেবে পান না। পূর্ব-বাংলার সেই 'নদী-জপ-মালা ধৃত' প্রান্তর কেমন করে যেন কবির বন্ধু, কবির প্রেয়সী হয়ে গিয়ে তার আন্তরসংগীত মর্মে মর্মে অঙ্গীকার করে নেন তার আদি অন্ত আমাদের কল্পনাতে সবটা ধরা পড়ে না। এই প্রণয়িনী-স্বরূপা পূর্ববঙ্গকে কবি কখনও কখনও মাতৃজঠর হিসেবেও কল্পনা করে সুখ পেয়েছেন। অনেকবার পূর্ববঙ্গে এসে তাঁর মনে হয়েছে এ-যেন মাতৃক্রোড়, এখানে এলে তাঁকে যেন আলাদা করে আরোগ্য বা পুষ্টির কথা ভাবতে হয়

না। জননী-জঠরের সঞ্জীবনী শক্তিতে যেন সব অভাব সব ক্ষয়ক্ষতি পূর্ণ হয়ে যেত কবির।

পাহাড় তেমন করে টানত না কবিকে। চারদিকে গিরিপ্রাচীর বেষ্টিত হয়ে যেন দম বন্ধ হয়ে যেত তাঁর। দার্জিলিং, আলমোড়া মংপু—কোথাও গিয়ে কবি স্বস্তি পাননি। শান্তিনিকেতনের অনুর্বর রুক্ষ ভূসংস্থান সম্পর্কে কবির একটা আলাদা মমতা ছিল, শান্তিনিকেতনকে দ্বিতীয় গৃহ বলেও কল্পনা করেছেন—তবু তাকে প্রেয়সীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেননি। পূর্ববঙ্গে ব্যাপারটি ছিল অন্য রকমের। বাংলদেশের আকাশ বাতাস, জলস্থল তাঁর প্রাণে মুক্তির বাঁশি বাজাত। রোগে শোকে আনন্দে মিলনে বিরহে বেদনায় বাংলাদেশ তার দুখানি হাত প্রসারিত করে কবিকে বহুবার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছে, শান্তি দিয়েছে, তৃপ্তি দিয়েছে। এমনটি বার বার ঘটেছে কবির জীবনে।

১৯০৭-এর নভেম্বরে বন্ধু শ্রীশ চন্দ্র মজুমদারের গৃহে মুঙ্গেরে কবির কনিষ্ঠ সন্তান শমীন্দ্রনাথ শোচনীয়ভাবে মারা গেলেন। শোকে দুঃখে কবির হৃদয় খান খান হয়ে গেলেও কাউকে বুঝতে দেননি। তিনি পালিয়ে এলেন শিলাইদহের শান্তিদায়ী নদীস্রোতের আশ্রয়ে। সেবার তাঁর চার মাস সময় লেগেছিল সুস্থতা ফিরে পেতে। আবার, ১৯১২ সালের মার্চে বিলেত যাত্রার সব আয়োজন শেষ করেও অকস্মাৎ অসুস্থতার কারণে কবির ভ্রমণ বাতিল করতে হল। কবি বিশ্রামের জন্য বেছে নিলেন শিলাইদহের সেই পদ্মাতীরের বালুচরের নিভৃতিকে। তিনি ইচ্ছে করলে পাহাড়ে যেতে পারতেন, শান্তিনিকেতনে আশ্রয় নিতে পারতেন,—কিন্তু তা তিনি নেননি। তখন তাঁর দরকার ছিল দিগন্তবিস্তারি আকাশ, নদীতীরের সবুজ শ্যামলের হিল্লোল, নির্মল প্রভাত, মন্ত্রময়ী জ্যোৎস্নালোক। শিলাইদহে, এই পরিবেশে স্থির হয়ে বসতে পেরেছিলেন বলেই না। গীতাঞ্জলির গানগুলি অনায়াসে ইংরেজিদে অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৪

কবি যতদিন পূর্ববঙ্গের জমিদারিগুলি দেখাশুনা করবার দায়িত্বে ছিলেন ততদিন বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা চিঠিপত্রে শিলাইদহ প্রসঙ্গে ভূরিপরিমাণ উল্লেখ আছে। **জীবনস্মৃতি** এবং **ছেলেবেলা** গ্রন্থেও বারবার শিলাইদহের প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে। আব্দুল মাঝির আষাঢ়ে গল্প কি কবি কখনো ভুলতে পেরেছেন? বোধ হয় না। সেই অসম সাহসী ব্যক্তিটি বাঘের গলায় দড়ি পরিয়ে নৌকোর গুণ টানিয়েছিল অবিশ্বাস্য গতিতে। শিলাইদহের স্থান কাল মাহাত্ম্যে আমাদেরও মাঝে মধ্যে মনে হয়—কি জানি, এমনটি সত্যি হলেও হতে পারে। কিন্তু এজমালি জমিদারি একদিন ভাগ হয়ে গেল। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেছে নিলেন পদ্মাশোভিত কবির প্রাণপ্রিয় শিলাইদহ অঞ্চল। অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ পেলেন সাজাদপুর, আর কবির ভাগ্যে জুটল পতিসর অঞ্চল। এ-হেন বিভাজনে কবি ব্যথা পেলেও মেনে নিয়েছিলেন—সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে। পদ্মাও বুঝি কোনো অজ্ঞাত অভিমানে শিলাইদহের কুঠিবাড়ি থেকে বহু দূরে সরে গেল। ১৯২২-এর ৬ এপ্রিল অমিয় চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে কবি লিখেছেন : 'আমার চিরপরিচিত পদ্মা শিলাইদা ছেড়ে দূরে কোথায় চলে গেছে তার নাগাল পাবার জো নেই। আমার পক্ষে এই বিচ্ছেদটি সামান্য নয়। যেন অলকাপুরীতে ঐশ্বর্য্য সবই আছে কেবল স্বয়ং লক্ষ্মীই নেই।' অবশ্য অমিতব্যয়ী সুরেন্দ্রনাথও শিলাইদহের জমিদারি

বেশিদিন রক্ষা করতে পারেননি, হাত বদল হল অচিরেই। শিলাইদহ নিয়ে কবির সাধ, স্বপ্ন, প্রগলভ বাণীও ধীরে ধীরে শমে এসে থামল একদিন।

শিলাইদহ নিয়ে কবির প্রগলভতার কথা যখন উঠলই তখন সেটি নিয়েই প্রথমে বলা কওয়াটা সেরে নিতে পারা যায়। শিলাইদহ প্রসঙ্গে কবি বাণীর বন্যায় নিজেকে উজার করে ভাসিয়ে দিয়েছেন, আমাদেরও ভাসিয়েছেন। কবি শিলাইদহের দায়িত্ব পেয়েই উৎফুল্ল হয়েছিলেন—যেন সব কিছুই পাওয়া হয়ে গেছে। জমিদারির কর্তৃত্বের প্রথম পর্বটি কবির কলমে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে **ছিন্নপত্রাবলীর** ২৫২টি চিঠিতে। অবশ্য সবগুলিই শিলাইদহ বা বাংলাদেশ থেকে লেখা নয়, দার্জিলিং, কলকাতা, উড়িষ্যা ও শান্তিনিকেতন থেকে লেখা বেশ কিছু পরিমাণ চিঠিও কালানুক্রম রক্ষা করতে গিয়ে, কিংবা ইন্দিরা দেবীকে উদ্দেশ্য করে লেখা বলেই কবি কিছুই বাদ না দিয়ে নির্বাচন পর্বটি সমাধা করেছেন। হিসেবে করলে দেখা যায় শুধু বাংলাদেশ থেকে লেখা, **ছিন্নপত্রাবলীতে** স্থান পেয়েছে এমন চিঠির সংখ্যা ১৭৪টি। এর মধ্যে—

শিলাইদহে থেকে লেখা—৯৫টি
সাজাদপুর থেকে লেখা—৩৪টি
পতিসর থেকে লেখা—২১টি
চুহালির জলপথ থেকে লেখা—২টি
নাটোর থেকে লেখা—২টি
দিঘপতিয়া থেকে লেখা—২টি
কুষ্টিয়া থেকে লেখা—৪টি
কালীগ্রাম থেকে লেখা—৫টি
পাবনা থেকে লেখা—১টি
গোয়ালন্দ থেকে লেখা—১টি
রামপুর বোয়ালিয়া থেকে লেখা—৫টি
স্থানের উল্লেখ—এমন চিঠি ২টি

ছিন্নপত্রাবলীর চিঠির যে তালিকা এখানে পেশ করা হল। সেগুলি কালক্রমের বিচারে ১৮৮৭-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রসারিত। অর্থাৎ, আট বছরের মতো সময়সীমায় লেখা। ১৮৯৫-এর পর **ছিন্নপত্রাবলী**-র পত্রধারা যেন কিছুটা আকস্মিকভাবে বিরতিতে এসে পৌঁছেছে। ইতোমধ্যে কবি কার-ঠাকুর কোম্পানীর কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইন্দিরা দেবীর বিবাহিত জীবন আরম্ভ না হলেও মঞ্চে প্রমথ চৌধুরীর আগমন আকর্ষণ সম্ভবত তীব্র হচ্ছিল। কবিও যেন সেইভাবে নতুন কোনো প্রাপক-বা প্রাপিকাকে খুঁজে পান নি যিনি কবির এই সব ভারহীন পত্রগুলির মাধুর্য উপভোগ করতে পারতেন।

৫

এই পর্বটি আমাদের প্রবন্ধের পরিশিষ্ট অংশ। এখানে আমরা একটা তথ্য তালিকা পেশ করলাম বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বিভিন্ন চিঠিতে কবির মন্তব্যগুলি তুলে ধরতে। কালানুক্রমিক এই পঞ্জীতে সব তথ্য দেওয়া স্থানাভাবেই কঠিন, সুতরাং কোনো অসংগতি থাকলে পাঠকেরা মার্জনা করে নেবেন।

১৮৭৫ ডিসেম্বর ৫ ঃ পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বাংলাদেশে আগমন। কবির বয়স তখন ১৪ বছর। ছিলেন শিলাইদহের বোটে। বোটে ছিল গীতগোবিন্দ কাব্যের একটি খণ্ড। বৈষ্ণব কবিতার রসাস্বাদনের দীক্ষা কবির সেই প্রথম। এ-যাত্রায় বৌঠান কাদম্বরী দেবীর কাছে থেকে কবি চারখানি চিঠি পেয়েছিলেন, সদর দপ্তরের হিসাবের খাতায় ডাকটিকিটের খরচ—যা লিপিবদ্ধ আছে তা থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তবে চিঠিগুলির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। ১৭৯৭ শকের মাঘ সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাসূত্রে জানা কবি-এ যাত্রায় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রামপুর বোয়ালিয়ার ব্রাহ্ম সমাজেও এসেছিলেন এবং প্রায় ৩০০ ব্রাহ্মভক্তের সামনে গান করেছিলেন। কবি কলকাতায় ফিরেছিলেন সম্ভবত ২২ ডিসেম্বর।

১৮৭৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কবি এবছর আনুমানিক ১৬ ফেব্রুয়ারি ফের শিলাইদহে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পূর্ব থেকেই সেখানে স্থিত। এ-যাত্রায় কবি শিলাইদহে ছিল কম বেশি এক মাস সময়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে কবির ঘোড়ায় চড়ার শিক্ষানবিশী, ফুলের রস দিয়ে কালি তৈরি করে কবিতা লিখবার ব্যর্থ চেষ্টা।

১৮৮৩ ঃ পদ্মার ভাঙনে শিলাইদহের কুঠি বাড়ি বিপদের মুখে। একটু দূরেই নূতন কুঠিবাড়ি নির্মাণ।

ডিসেম্বর ৯ ঃ কবির বিবাহ, পাত্রী যশোহরের ভবতারিণী দেবী-ঠাকুর বাড়িতে যাঁর নতুন নামকরণ হল মৃণালিনী দেবী। বিবাহের দুদিন আগে বক্সার থেকে কবিকে পিতার পত্র—নির্দেশ ছিল কলকাতায় সদর কাছারিতে বসে জমিদারির কাজে মনোনিবেশ করার। কবির সম্ভবত ইচ্ছা ছিল মফঃস্বলে নির্জনতার মধ্যে স্থিত হবার, কিন্তু মহর্ষি অনুমোদন দেন নি।

১৮৮৮ নভেম্বর ডিসেম্বর ঃ ছিন্নপত্রাবলীর পত্রধারার সূচনা। শিলাইদহের পদ্মাতীরের নৈসর্গিক সৌন্দর্যে কবি মোহমুগ্ধ। লিখছেন ঃ 'উপরে অনন্ত নীলিমা আর নীচে অনন্ত পাণ্ডুরতা, আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য।...পৃথিবী যে বাস্তবিক আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। পৃথিবীকে কবি সম্ভবত এই প্রথম 'আশ্চর্য সুন্দরী' বলে অনুভব করলেন। এই আশ্চর্য সুন্দরীকে প্রেয়সী বলে প্রণয়িণী হিসেবে ভাবা তো আর এক পদক্ষেপের ব্যাপার।

Animal Magneticsm নামে একটা 'একখানা অত্যন্ত ঝাপসা Subject-এর' বইপাঠ। জমিদারী পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে সপরিবারে শিলাইদহে। বাক্যবাগীশ মৌলবীর সঙ্গে কবির পরিচয়।

১৮৯০ জানুয়ারি ১৩ ঃ কবি সাজাদপুর জমিদারিতে। জানুয়ারি ২০ ঃ সাজাদপুরে হাইস্কুলের সুনীতি সঞ্চারিণী সভা পরিদর্শন। কবির রাজর্ষি বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত।

জুন ২১ ঃ চিত্রাঙ্গদা রচনার সূত্রপাত, পরে কটকে রচনাটির সমাপ্তি। অক্টোবর ৩ ঃ বিলেত থেকে ইন্দিরা দেবীকে পত্র—'এ দেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা মাতৃভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা বলে মনে হয়। কবি 'মাতৃভূমি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন—কিন্তু অনায়াসে বলতে পারতেন 'বাংলাদেশ বা পূর্ববঙ্গ'।

১৮৯১ জানুয়ারি ১৭ ঃ কবি কালীগ্রামের জমিদারিতে। কবির অনুভবে পৃথিবীটা চৈতন্যময় প্রাণীবিশেষ। কালীগ্রামের 'দিনগুলো এই রকম বারো ঘণ্টা পড়ে পড়ে

কেবল রোদ পোহায় এবং অবশিষ্ট বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা যায়।'—এর পর কয়েকদিন কবি ঘুরে ফিরে পতিসর—কালীগ্রামের জলে জলে সঞ্চারমান। সাজাদপুরের পোস্ট-মাস্টারের সঙ্গে আলাপ।

১৮৯১ জানুয়ারি ২১ ঃ মোহময়ী কালীগ্রামকে অনুভব করে কবির নিবেদন—'ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি—ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা—সুদ্ধ দুহাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম।' —লক্ষ করবার বিষয় কবির ব্যক্তি-অনুভূতি কেমন করে সর্বানুভূতির রূপ পরিগ্রহণ করছে।

কবি সাজাদপুরেই, মফঃস্বল-পরিদর্শনরত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ঝড় জলে কুঠিবাড়িতে আশ্রয় দান।—ইন্দিরা এ চিঠি পেয়েছেন সম্ভবত ২৮ জানুয়ারি।

জানুয়ারি ২৯ ঃ কবির দার্শনিক উপলব্ধি তাঁর কাব্য সৃষ্টির পিছনে দুটি বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে অবিশ্রাম। এক দিকে বেদনা আর অন্য দিকে বৈরাগ্য। একদিকে কর্মের প্রতি টান, অন্য দিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ।

১৮৯১ ফেব্রুয়ারি ১০ ঃ ইন্দিরা দেবীকে কবির পত্র। সম্পূর্ণ চিঠিতেই সেই সর্বানুভূতির মোহময় আবেশ। কবি লিখেছেন ঃ 'অনেকদিন পরে আবার এই বড়ো পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখা সাক্ষাৎ হল। সেও বললে, এই—যে!' আমিও বলুলম, 'এই-যে'।'

জুন ৩ ঃ সাজাদপুর থেকে স্ত্রীকে কবির পত্র—'আচ্ছা আমি যে সাজাদপুরের সমস্ত গোয়ালার ঘর মন্থন করে উৎকৃষ্ট মাখন মারা ঘের্ত্ত সেবার জন্য পাঠিয়ে দিলুম তৎসম্বন্ধে কোনরকম উল্লেখমাত্র করলে না তার কারণ কি বল দেখি?'—কবির চিঠিতে ঘি পাঠাবার কথা আছে, কিন্তু সাজাদপুরের সকাল সন্ধ্যার কোন সৌরভের কথা কবির চিঠিতে নেই—যা ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিগুলিতে বারবার এসেছে।

জুন ১৬ ঃ চুহালির জলপথে। ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন 'এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে গ্রামের উপরে, সন্ধেটা, কী চমৎকার, কী প্রকাণ্ড।'

জুন ১৯ ঃ চুহানিতে, প্রচণ্ড ঝড় জলের মধ্যে।

জুন ২০ ঃ সাজাদপুরে ঝড়জলের বিরাম নেই। 'ছুটি' গল্পের ফটিকদের কবি এখানেই দেখেছেন। ৪ জুলাই পর্যন্ত কবির এখানেই স্থিতি।

অক্টোবর ১ ঃ শিলাইদহ থেকে কবি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন—'পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশান্ত প্রাণ এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না।'—এই অনুভব নতুন কিছু নেই ছিন্নপত্রে শতাধিক চিঠিতে তো এরই ভূরিপরিমাণ পুনরাবৃত্তি। কিন্তু কাছে এ পুরাতন হয়েও চিরনতুন।

১৮৯২ জানুয়ারি ৪ ঃ সাহেব ইঞ্জিনিয়ারকে সপরিবারে শিলাইদহে আশ্রয় দান। অনবদ্য কৌতুকে ইন্দিরা দেবীকে কবি জানাচ্ছেন মেম সাহেব তার ক্ষুদ্র শাবকটিকে ধমক দিচ্ছে— 'What a littile শুয়ার you are!'

জানুয়ারি ১২ ঃ শিলাইদহে কালিদাসের মেঘদূত পড়ে কবির উপলব্ধি—'সৌন্দর্য যে মনের মধ্যে একটা নিগূঢ় রহস্যময় অসীম আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে যা মনকে জন্ম থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে যায় তা সম্পূর্ণ সত্য।'

এপ্রিল ৭ ঃ ছিন্নপত্রাবলী-তে কবির দার্শনিক উপলব্ধি—'মেয়েতে জলেতে বেশ মিশ খায়।...মেয়েরা জল ভালোবাসে, কেননা উভয়ে স্বজাত। অবিশ্রাম সহজ প্রবাহ এবং কলধ্বনি জল এবং মেয়ে ছাড়া আর কারও নেই।'

মে ৩০ ঃ 'হিং টিং ছট' কবিতাটির রচনা।

জুন ঃ কবি ভ্রমণরত—শিলাইদহ, সাজাদপুরে। পড়ছেন কালিদাস, রচিত হচ্ছে গোড়ায় গলদ।

জুলাই ৫ ঃ সাজাদপুরে জমিদারির পুণ্যাহ। সানাইতে ভৈরবী রাগ শুনে কবির সুরানুভূতি অতলস্পর্শী। লিখেছেন—'আমার চোখের সামনেকার শূন্য আকাশ এবং বাতাস পর্যন্ত একটা অন্তর নিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে যেন স্ফীত হয়ে উঠছিল—বড়ো কাতর কিন্তু বড়ো সুন্দর।'

জুলাই ঃ আগস্ট ঃ গড়ুই নদীর ব্রিজে নৌকোর মাস্তুল ঠেকে প্রাণ বিপন্ন হয়েছিল কবির। এই বিপদটুকু বাদ দিলে কবি-প্রাণ শারদ শোভায় মন্ত্রমুগ্ধ।

ঃ 'বৈষ্ণব কবিতা', 'দুই পাখি', 'গান ভঙ্গ' রচনা।

ডিসেম্বর ১ ঃ বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে নিয়ে ২৮ মাইল দীর্ঘ পথ ঘোড়ার গাড়িতে অতিক্রম। কবি ডুবে রইলেন তাঁর প্রিয় বৈষ্ণব সংগীত 'সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি'র ছত্রগুলির মধ্যে।

ডিসেম্বর ৯ ঃ ইন্দিরা দেবীকে চিঠি—শিলাইদহ প্রসঙ্গে সেই অন্তহীন ভালোবাসার বর্ণময় বাণী 'অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; গভীর ও সুদূরব্যাপী চেনা শোনা আছে।'

১৮৯৩ মার্চ ২৩ ঃ রামপুর বোয়ালিয়ায়।

'সুখ', 'দুর্বোধ', 'ঝুলন' রচনা।

মে ৮ ঃ শিলাইদহে জন্মদিন পালিত। রবিবর্মার আঁকা ছবি দেখে আনন্দ প্রকাশ।

জুন ঃ শিলাইদহে বসে রচিত হল—'হৃদয় যমুনা', 'ব্যর্থ যৌবন'।

জুলাই ২৮ ঃ সাজাদপুরে রচিত হল—কবির ৬৬২ ছত্রের দীর্ঘতম কবিতা—'পুরস্কার'।

ঃ সুমারন্তবিশ (হিসাবরক্ষক) জগদানন্দ রায়কে তাঁর রুচি ও যোগ্যতার নিরিখে শিলাইদহে গৃহশিক্ষক নিয়োগ।

আগস্ট ১১ ঃ অনেকগুলি বড়ো বিল পার হয়ে কবি পতিসরে। চলমান মাঝির মুখে গান —'যোবতী ক্যান বা কর মন ভারী / পাবনা থেকে আন্যে দেব ট্যাকা দামের মোটরি।'

ঃ পূর্ব বাংলার ছড়া সংগ্রহ করে দেবার জন্য সরলা রায়কে পত্র-প্রেরণ।

আগস্ট ২১ ঃ কালীগ্রামের সহজ সরল প্রজাদের স্মরণ করে ইন্দিরা দেবীকে চিঠি—'আহা', এমন প্রজা আমি দেখিনি। এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে।'

১৮৯৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মাসের দ্বিতীয়ার্ধে কবি আত্রাই হয়ে পাল্‌কিতে পতিসরে। পথে বঙ্কিমচন্দ্রে রাজসিংহ পাঠ।

মার্চ ৬ ঃ 'এবার ফিরাও মোরে' রচনা।

মার্চ ২২ ঃ ছিন্নপত্রাবলীতে কবির সিদ্ধান্ত—'সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম জীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি।'

ঃ Amiel's Journal পাঠ। এটি কবির 'মনের মত বই।'

জুন ২৬ ঃ Contemporary Thoughts and Thinkers পাঠ। 'নির্জন নিঃশব্দ খ্যাতিহীনতায়' ফিরতে চান কবি।

জুন ২৭ ঃ ছোটোগল্প লেখবার জন্য উৎসুক। **'মেঘ ও রৌদ্র'** রচনা।

আগস্ট ৩ ঃ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মুজমদারকে নিয়ে শিলাইদহে।

আগস্ট ৭ ঃ শিলাইদহে পরিপূর্ণ বর্ষা। উপভোগ নিয়ে ইন্দিরা দেবী পত্র—'একটি মাত্র মানুষ কেবলমাত্র সামনে থাকলেই প্রকৃতির অর্ধেক কথা কানে আসে না।'

সেপ্টেম্বর ৪ ঃ কবি সাজাদপুরে।

সেপ্টেম্বর ৯ ঃ পতিসর যাত্রা। ১০ তারিখে ইন্দিরা দেবী লিখছেন—'এই শৈবাল বিকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জল রাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্র পড়েছে, আমি জানালার ধারে এক চৌকিতে বসে অন্য চৌকিতে পা তুলে দিয়ে সমস্ত দিন কেবল গুণ্ গুণ্ করে গান করছি।'

১৮৯৫ জানুয়ারি ৩০ ঃ কবি শিলাইদহে। ইন্দিরা দেবীকে বাল্যস্মৃতি-সুরভিত বহু পত্র প্রেরণ।

মে ৩১ ঃ ইন্দিরা দেবীকে কবির চিঠি—'নির্জনতা যেন আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।'

জুলাই ঃ কার-ঠাকুর কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা। প্রধান কার্যালয় কুষ্টিয়ায়।

অক্টোবর ৪ ঃ শিলাইদহ থেকে পর পর দু'খানি চিঠিতে ইন্দিরা দেবীকে 'জীবন-দেবতা' বিষয়ে ধারণা ব্যাখ্যা।

অক্টোবর ১৫ ঃ কবি সস্ত্রীক শিলাইদহে, সঙ্গে সুনাগরিক অমলা দাশ। তাঁকে মনে রেখে কবির রচনা—'ওলো সই, ওলো সই, 'একি আকুলতা ভুবনে', এবং 'চিরসখা হে ছেড়ো না।'

ডিসেম্বর ৭ ঃ শিলাইদহে গমনের পথে পর পর ৩ দিনে রচিত হল 'আবেদন' 'উর্বশী' ও 'স্বর্গ হইতে বিদায়।'

১৮৯৬ মার্চ ২ ঃ শিলাইদহে কবির রচনা 'সিন্ধুপারে'। এরপ এল 'চৈতালি'-নাগর নদীর পটভূমিতে পঞ্চাশটি কবিতা। নাগর নদীর মতই মন্থর তার ছন্দ ও গতি।

এপ্রিল ৬ ঃ কবি এদিন লিখছেন অবিস্মরণীয় 'পদ্মা' কবিতাটি।

'হে পদ্মা আমার, তোমায় আমায় দেখা শত শত বার। একদিন জনহীন তোমার পুলিনে গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে, সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান তোমারে সঁপিয়া ছিনু আমার পরাণ।'

ঃ দীর্ঘদিনের শিক্ষানবিশীর শেষে এত দিনে সাজাদপুরের সর্বময় কর্তৃত্ব কবির উপর অর্পিত হল। 'বাটি ও পরগণার কার্য্য' দেখাশুনার জন্য কবির অতিরিক্ত মাসিক ভাতা ২০০ টাকা ধার্য।

ঃ কার-ঠাকুর কোম্পানীর ব্যবসা নিয়ে ভাবনা। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে গোলাপফুলের চাষ এবং সুতোর ব্যবসা নিয়ে উৎসাহ দান।

১৮৯৮ জুন ১০ ঃ নাটোরে বেঙ্গল প্রভিন্স্যাল কনফারেন্স। কবি উপস্থিত। সভার কাজ বাংলায় চালাবার চেষ্টা। সভার শেষ দিনে ভূমিকম্প।

সেপ্টেম্বর ঃ কবি ক্রমান্বয়ে শিলাইদহে সাজাদপুরে এবং পতিসরে। বেশ কয়েকটি

জমিদারির খাজনায় কবির অরুচি—কারণ সেটা ভোগ করা পরজীবীর ধর্ম।

জুন ৪ ঃ সতীশচন্দ্র ঘোষকে কবির পত্র—প্রজাদের অবস্থা এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাপের নিরিখে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থাকে নমনীয় করার নির্দেশ।

নভেম্বর ঃ 'হুংকার' গ্রন্থ প্রকাশ করে শিক্ষক হীরালাল সেন রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। ব্রিটিশ শাসক ওই গ্রন্থে রাজদ্রোহের আভাস পেয়ে হীরালাল সেনকে অভিযুক্ত করে, কবিকেও সাক্ষ্য দিতে আদালতে উপস্থিত করা হয়।

১৯০৯ নভেম্বর ঃ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ প্রত্যাগমন। তাঁকে শিলাইদহ অঞ্চলে প্রজাহিতে কৃষিকর্মে সংযুক্ত করার বাসনা কবির।

১৯১০ অক্টোবর ১৩ ঃ কবি শিলাইদহে। রথীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবী এখানেই সংসার পাতেন। কবি এখানেই পড়েছেন From the bottom up গ্রন্থখানি।

১৯১১ ঃ কবি শিলাইদহ কলকাতা এবং শান্তিনিকেতনের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছেন। শিলাইদহে ধান ভানা কল বসাবার চিন্তা ঘুরছে মাথায়।

১৯১২ ফেব্রুয়ারি ১৯ ঃ কবি শিলাইদহে।

মার্চ ২৪ ঃ বিলাতযাত্রা বাতিল হলে বিশ্রামের জন্য কবি শিলাইদহে। সেখানে পদ্মার জলধারা এবং প্রকৃতির বাসন্তিক শুশ্রূষায় কবির অভাবনীয় আরোগ্য। ইন্দিরা দেবীকে কবি লিখেছিলেন—'শিলাইদহে তখন চৈত্র মাসে আমের বোলের গন্ধে আকাশে আর কোথাও ফাঁক ছিল না এবং পাখির ডাকাডাকিতে দিনের বেলাকার সকল ক'টা প্রহর একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল।' এই পরিবেশে কবি হাত দিলেন ইংরেজি গীতাঞ্জলির অনুবাদ কর্মে।

১৯১৪ জানুয়ারি ঃ কবির নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পুরস্কারের লক্ষাধিক টাকা কালীগ্রামে পতিসরের কৃষি ব্যাঙ্কে জমা। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—ওই জমা অর্থ থেকে প্রজারা ঋণ নেবেন সহজ সুদে। আবার সেই সুদের টাকা ব্যয়িত হবে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে। জামাতা নগেন্দ্রনাথকে দেড়'শ টাকা বেতনে ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা নিয়োগ।

ফেব্রুয়ারি ঃ পাবনায় উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন—কবি উপস্থিত।

১৯১৫ ফেব্রুয়ারি ১ ঃ কবি শিলাইদহে—সঙ্গী মুকুল দে। সুরেন্দ্রনাথ কর ও নন্দলাল বসু। নন্দলাল বসু লিখেছেন—'আমাদের হলো হাতে কলমে নেচার স্টাডির সেই হাতে-খড়ি।'

ডিসেম্বর ঃ পূর্ববঙ্গের জমিদারিতে জোরদার পল্লী উন্নয়নের চেষ্টা। চিকিৎসা, প্রজাহিতে শিক্ষা, পূতকর্ম, ঋণদান ও সালিসি বিচারব্যবস্থা পত্তন।

ঃ পতিসরে হিতৈষী ফণ্ডের পুনর্গঠন।

১৯২২ মার্চ ৩০ ঃ কবি শিলাইদহে। অন্তত ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সেখানেই স্থিতি।

১৯২৬ ফেব্রুয়ারি ৬ ঃ ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে বিশাল দলবল নিয়ে কবি ঢাকায়।

ফেব্রুয়ারি ঃ কবি ময়মনসিংহ শহরে।

১৯৩৭ জুলাই ১৭ঃ জমিদারির পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে কবি পতিসরে। প্রজাদের সম্মিলিত সংবর্ধনায় কবি আনন্দিত। এটিই কবি জীবনের শেষ বাংলাদেশ ভ্রমণ।

পান পাওয়া।

১৮৯৮ মে ২৪ ঃ একাকী শিলাইদহে

মে ৩০ ঃ ঢাকাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন।

জুন ২ ঃ স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে চিঠি—কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃতে পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি।

জুলাই ঃ স্ত্রীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো শিলাইদহে গৃহস্থাপনা। পুত্র কন্যাদের শিক্ষার জন্য এলেন লরেন্স সাহেব, শিবধন বিদ্যার্নব।

আগস্ট ১৩ ঃ লরেন্স সাহেবের জন্মদিন উদ্‌যাপন, কবির ব্যয় বারো টাকা।

১৮৯৯ ফেব্রুয়ারি ২ ঃ দৈব দুর্যোগ কালীগ্রামে ফসল হানি। খাজনা আদায়ে নায়েব শৈলেশচন্দ্র মজুমদার নমনীয় হতে নির্দেশ।

এপ্রিল ১৩ ঃ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসুস্থ। কার-ঠাকুর কোম্পানীর ঋণদায়ে কবি বিব্রত।

১৯০০ মার্চ ঃ কন্যা বেলার বিবাহ ব্যাপারে কবি চিন্তিত।

১৯০১ জুন ২৫ ঃ জমিদারির পুণ্যাহে কবি শিলাহইদহে, সঙ্গে পুত্র রথীন্দ্রনাথ।

১৯০২ জানুয়ারি ২৭ ঃ নানা পারিবারিক বিপর্যয়ে কবি বিভ্রান্ত। তবু এদিন শিলাইদহে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় নিয়ে কবি ব্যস্ত। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শান্তিনিকেতনে নিয়োগ।

নভেম্বর ২৩ ঃ স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু।

১৯০৪ ফেব্রুয়ারি ১ ঃ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের বসন্ত রোগে মৃত্যু। কবি কর্তৃক বিদ্যালয় শিলাইদহে স্থানান্তরিত।

ডিসেম্বর ৩০ ঃ জগদীশচন্দ্র বসু স্বস্ত্রীক শিলাইদহে কবির আতিথ্যে, সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা। ১৯০৫-এর ২ জানুয়ারি কবির প্রত্যাবর্তন।

১৯০৫ অক্টোবর ১৬ ঃ প্রশাসন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা। অন্যদের সঙ্গে প্রতিবাদ মুখর কবিও উত্তেজিত। বহু দেশাত্মমূলক গান রচনা। 'আমার সোনার বাংলা' গানটি তো এখন বাংলা দেশের জাতীয় সংগীত। এসব গান মুখ্যত পূর্ব বাংলাকে স্মরণ করেই লেখা।

১৯০৭ জানুয়ারি ৩১ ঃ কবি শিলাইদহে, কন্যা মীরার বিবাহের জন্য উদ্বিগ্ন।

মার্চ-এপ্রিল ঃ রথীন্দ্রনাথের আমেরিকা যাত্রা কবির ইচ্ছা তিনি সেখানে কৃষিবিদ্যা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নেবেন।

এপ্রিল ঃ বাংলাদেশের বরিশালে সাহিত্য সম্মেলনে নানা বিশৃঙ্খলায় কবি বিব্রত।

ডিসেম্বর ৬ ঃ পুত্র শমীন্দ্রনাথের শোচনীয় মৃত্যুর পর বেদনাজীর্ণ কবির শিলাইদহের নিভৃতিতে আত্মগোপন। এই সময়েই 'অন্তর মম বিকশিত কর' গানটি রচিত।

১৯০৮ জানুয়ারি ২৪ ঃ পূর্বেই জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও আমেরিকায় প্রেরণ—কৃষি কর্মে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের জন্য। এদিন অজিতকুমার চক্রবর্তীকে কবি লিখেছেন —'আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজ্য স্থাপন করিতে চাই।'

মার্চ ২১ ঃ কালীমোহন ঘোষকে পূর্ববঙ্গে পল্লী সংগঠনের কাজে যুক্ত করলেন কবি।

মার্চ ৩০ ঃ জামাতা নগেন্দ্রনাথকে কবির পত্র—তাঁর প্রত্যাশা রথীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এবং নগেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এসে প্রজাদের মঙ্গলে আত্মনিয়োগ করবেন।